চীন: পরাশক্তির বিবর্তন-৩

বিপ্লবী রূপান্তরের গতি ও সমস্যা

আনু মুহাম্মদ

চীন সমাজতান্ত্রিক না পুঁজিবাদী না নতুন এক ব্যবস্থার দেশ? এই প্রশ্ন নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক থাকলেও এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বর্তমান বিশ্বে চীন এক পরাশক্তি। প্রচলিত জিডিপি বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। আর ক্রয়ক্ষমতার সমতার নিরিখে (পিপিপি) বিচার করে চীন এখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এর পাশাপাশি চীন সাম্রাজ্যবাদী বিশেষণেও অভিহিত হচ্ছে। এই চীন তার বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে বিপ্লব করেছিল? বিপ্লবের পর চীনের অগ্রযাত্রা আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো? সম্প্রতি চীনের দ্রুত বিস্ময়কর অর্থনৈতিক গতির রহস্য কী? দেশের ভেতর বৈষম্য, দুর্নীতি বৃদ্ধি, বিশাল ধনিক গোষ্ঠীর প্রবল আধিপত্য ইত্যাদির সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একক শাসন কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ? কথিত বাজার সমাজতন্ত্রেরই বা স্বরূপ কী? বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এর তাৎপর্য কী? এসব প্রশ্ন অনুসন্ধান করতেই এই লেখার পরিকল্পনা। কয়েক পর্বে প্রকাশিতব্য এই লেখার তৃতীয় পর্ব এটি। এই পর্বে বিপ্লব-উত্তর সংস্কার কর্মসূচির সাফল্য ও প্রতিবন্ধকতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সন্ত্রাসী ঘাঁটি: তাইওয়ান ও যুক্তরাষ্ট্র

চীনে বিপ্লবী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়। অন্যদিকে এই সরকারকে স্বীকৃতি দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, ভারতসহ আরও কয়েকটি রাষ্ট্র। বিপ্লবের পরই প্রথম বিদেশ সফরে যান মাও সেতুং, আর তা সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেসময়ই স্বাক্ষরিত হয় চীন-সোভিয়েত চুক্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ততদিনে বিশ্বের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভরকেন্দ্র বদলে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপ বিধ্বস্ত। বৃটেনের পক্ষে আর নেতৃত্বদানের অবস্থা ছিল না। ওদিকে প্রবল শক্তি নিয়ে বিশ্ব দরবারে হাজির সোভিয়েত ইউনিয়ন। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের উত্থানের কারণে বিশ্বজুড়ে হুমকির মুখে পতিত পুঁজিবাদী শক্তিকে সমর্থন দেবার অর্থনৈতিক ও সামরিক সামর্থ্য থাকার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হয়ে ওঠলো পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার নতুন কেন্দ্র, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নতুন নেতা।

চীন বিপ্লবের পর তাই এই অঞ্চলে তাইওয়ান ও কোরিয়া হয়ে দাঁড়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক আধিপত্য সৃষ্টির প্রধান অবলম্বন। এর আগে কুওমিনটাং এর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা কোনো কাজে দেয়নি। চিয়াং কাই শেক, তার নেতৃত্বাধীন কুওমিনটাং বাহিনী ও তার সমর্থক ধনিক গোষ্ঠী মূল ভূখণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় তারা ঘাঁটি গাড়ে ফরমোজা দ্বীপে যা পরে তাইওয়ান নামে পরিচিতি পায়। এই দ্বীপ চীনের অংশ ছিল বহুকাল আগে থেকে, সপ্তদশ শতকে কিং সম্রাটের সময় এটি আনুষ্ঠানিকভাবে চীনা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। উনিশ শতকের শেষে জাপান এটি দখল করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর আবার তা চীনের কর্তৃত্বে ফেরত আসে। জাপানি উপনিবেশকালে ব্যাপক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় সেখানে বসবাসরত চীনা মানুষেরা। তবে এই উপনিবেশকালেই এই দ্বীপে শিল্পায়ন, রেলপথ ও অন্যান্য পরিবহণের বিস্তার, সুসংগঠিত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামো গড়ে ওঠে।

প্রথমদিকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও এবং বিরক্তি দেখালেও যুক্তরাষ্ট্র তার আঞ্চলিক কৌশলের অংশ হিসেবে এই চিয়াং ও তার সহযোগীদের পুনর্বাসনে দৃঢ় সমর্থন দিয়েছে। বিপ্লবী সরকারও তাদের আর তাড়া করেনি, কিন্তু বরাবর তারা এই দ্বীপকে চীনের অংশ বলে দাবি করে এসেছে। তাইওয়ান নামে পরিচিত হলেও সরকারিভাবে এর নাম 'চীন প্রজাতন্ত্র'। তাইওয়ানে আগে থেকেই মানুষ ছিলেন প্রায় ৬০ লাখ। তার সাথে যোগ হলো চিয়াং কাই শেক-এর সাথে যাওয়া ২০ লাখ। এর প্রধান অংশ ছিল সেনাবাহিনীর লোকজন। এছাড়া চীনা বিপ্লব বিরোধী ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরাও ছিলেন। স্থানীয় মানুষজনের সাথে সংঘাত তৈরি হয়েছে প্রায়ই। সামরিক শাসনের মাধ্যমে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করে চিয়াং ও তার দলবল সেখানে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। তাদের জন্য মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সহায়তা ছিল অঢেল। মার্কিন পরিকল্পনা ছিল একদিকে সামরিক শক্তি হিসেবে এটিকে গড়ে তোলা, একে চীন বিরোধী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা এবং তাইওয়ানে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ নিশ্চিত করে পাল্টা একটি মডেল দাঁড় করানো। সে অনুযায়ী, তাইওয়ানে শিল্পায়নের ব্যাপক কর্মসূচি নেয়া হয়। চীন বিরোধী আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক তৎপরতায় যুক্তরাষ্ট্র অনেকখানি ভর করে এই দ্বীপরাষ্ট্রের ওপরই।

এসব নির্যাতিত পরিবারের প্রতি এই 'শ্বেতসন্ত্রাস' কালে যে অন্যায় করা হয়েছে তার জন্য প্রায় ৬০ বছর পর, মাত্র গত ২০০৮ সালে, তাইওয়ান সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে।

তাইওয়ানে ১৯৪৯ সালে চিয়াং কর্তৃক প্রবর্তিত সামরিক শাসন অব্যাহত থাকে দীর্ঘকাল, ১৯৮৭ পর্যন্ত। চিয়াং এর পর তাঁর পুত্র দেশের প্রধান হন। ১৯৪৯ থেকে কয়েক বছরে পুরো দ্বীপ জুড়ে শাসকদের ব্যাপক নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়। কমিউনিস্ট পন্থী বা কুওমিনটাং বিরোধী কাউকে মনে হলেই তার বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেয়া হতো। এই অপরাধে এই ছোট্ট দ্বীপরাষ্ট্রে প্রায় দেড়লাখ মানুষকে খুন অথবা কারাবাসের শিকার হতে হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ার সাথেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখ্য যে, এসব নির্যাতিত পরিবারের প্রতি এই 'শ্বেতসন্ত্রাস' কালে যে অন্যায় করা হয়েছে তার জন্য প্রায় ৬০ বছর পর, মাত্র গত ২০০৮ সালে, তাইওয়ান সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে।

চীনে বিপ্লবী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্র শুরু করে কোরিয়া যুদ্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার যুদ্ধ কার্যত চীন-সোভিয়েত অক্ষের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে পরিণত হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সেসময় চীনকে

মোকাবিলার জন্য তাইওয়ান প্রণালীতে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করেন। তবে তাইওয়ানকে ভর করে চীনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তার মিত্র দেশের অনেকেই একমত ছিল না।

মার্কিনী এই ভূমিকা বিচ্ছিন্ন কিছু ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সেসময়টি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও 'শ্বেত সন্ত্রাস' বা ম্যাককার্থিজমের কাল। বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, মিডিয়া, সাহিত্য, সঙ্গীত, গবেষণা এমনকি হলিউডে চলচ্চিত্র জগতে তখন 'বাম' বা 'কমিউনিস্ট' বিরোধী চিরুণী অভিযান চলছিল। শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে অসংখ্য মানুষ কাজ হারিয়েছেন, জেলে ঢুকেছেন, উধাও হয়ে গেছেন, অপদস্থ হয়েছেন, কুৎসা অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। এগুলো করা হয়েছে খুবই গোছানো সুসংগঠিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে। সিআইএ এফবিআই তখন এইকাজে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী।

চীন নিয়ে লেখালেখি ও গবেষণার সাথে যুক্ত অনেক ব্যক্তিও এর শিকার হন। এরকম একজনের নাম উইলিয়াম হিনটন। যাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ফানশেন চীনের বিপ্লবী রূপান্তর বোঝার জন্য অবশ্যপাঠ্য।

পাল্টে দেয়ার কাহিনী: ফানশেন

চীনে বিপ্লবী সরকার ক্ষমতাসীন হবার আগে থেকেই লালফৌজ নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন সোভিয়েত এলাকা বা মুক্তাঞ্চলে ভূমি সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের শেষদিকে খসড়া কৃষি আইন প্রণয়ন করা হয় এবং তা ঘোষণা করা হয় একই বছরের ২৮ ডিসেম্বর। মুক্তাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে এই আইন কার্যকর করতে করতে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানারকম সংযোজন বিয়োজনও চলতে থাকে।

এই কৃষি আইনের ১ নম্বর ধারায় বলা হয়, সামন্তবাদী ও আধা সামন্তবাদী শোষণমূলক কৃষি ব্যবস্থার চিরসমাপ্তি ঘটানো হবে এবং 'লাঙল যার জমি তার' এই নীতি বাস্তবায়ন করা হবে। ২ নম্বর ধারায় বলা হয়, সামন্তপ্রভুদের ভূমি মালিকানার অধিকার বিলুপ্ত করা হবে। ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়, সংস্কারের আগে গ্রামের মানুষের ওপর চাপানো সকল ঋণ বাতিল করা হবে। ৬ নম্বর ধারায় বলা হয়, গ্রামে জোতদারের সব জমি গ্রহণ করবে গ্রামের চাষী সমিতি। এই জমিসহ গ্রামের সকল জমি নিয়ে সমিতি গ্রামের সকল মানুষের মধ্যে, নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ, বিতরণ করবে। বিতরণের সময় বেশি উর্বর কম উর্বর বিবেচনা করতে হবে।

এই লেখায় কৃষি বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় ক্রমে ব্যাখ্যা করা হবে। তার আগে উইলিয়াম হিনটন এবং তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হবে। চীন বিপ্লবের প্রত্যক্ষদর্শী এবং এর গদ্যকার বিদেশিদের মধ্যে অন্যতম হলেন এই উইলিয়াম হিনটন। ১৯১৯ সালে শিকাগোতে জন্মগ্রহণের পর অল্প বয়স থেকেই জাপান কোরিয়াসহ পূর্ব এশিয়ায় ইংলিশ পত্রিকায় সাংবাদিকতা করছিলেন। অর্থের অভাবে হোটেলে ঘটিবাটি পরিষ্কার করেও জীবিকা নির্বাহ করেছেন অনেকসময়। ১৯৪২ সালে তিনি এডগার স্নো-র 'রেড স্টার ওভার চায়না' পড়বার পর তাঁর আগ্রহ ও চিন্তাভাবনার অনেককিছুই পাল্টে যায়। স্নো এবং তাঁর এই বই সম্পর্কে আমি আগে কিছু আলোচনা করেছি। মার্কসবাদ নিয়ে লেখা না হলেও এই বই হিনটনকে মার্কসবাদ ও বিপ্লবী লড়াইএ আকৃষ্ট করে।

১৯৪৫ এ হিনটন 'ইউ এস অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশন'-এর একজন সদস্য হিসেবে চীন সফর করেন। সেসময় কুওমিনটাং ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যকার আপোষ আলোচনাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেসময়ই তাঁর মাও সে তুং ও চৌ এন লাই-এর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়। ১৯৪৭ সালে যুদ্ধোত্তর বিভিন্ন কর্মসূচির অধীনে জাতিসংঘ থেকে চীন সরকারকে কিছু ট্রাক্টর দেয়া হয়। এবং এগুলোর সাথে চীনে আসেন কয়েকজন প্রশিক্ষক, এদের একজন ছিলেন হিনটন। এগুলো দেয়া হয় কুওমিনটাং এলাকায়। হিনটন মুক্তাঞ্চলেও যান এবং দুই অঞ্চলের পার্থক্য তাঁকে আরও প্রভাবিত করে।

জাতিসংঘের কাজ শেষ হলেও তিনি থেকে যান মুক্তাঞ্চলে, মুক্তাঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ শিক্ষক হিসেবে। ১৯৪৮ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রামে ভূমি সংস্কার সহযোগী দল পাঠানো হয়। তিনি এইরকম একটি দলে পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং চাংজির লংবো নামক গ্রামে ভূমি সংস্কার প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকেন। এই গ্রামে তিনি অবস্থান করেন একটানা আট মাস, রাতদিন ছোট বড় সভা সমিতিতে যোগ দেন এবং নোট রাখেন বিস্তারিত। গ্রামের মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে হিনটনের, পরের কয়েক দশকেও যার ছেদ পড়েনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সেসময়টি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেও 'শ্বেত সন্ত্রাস' বা ম্যাককার্থিজমের কাল। বিশ্ববিদ্যালয়, কারখানা, মিডিয়া, সাহিত্য, সঙ্গীত, গবেষণা এমনকি হলিউডে চলচ্চিত্র জগতে তখন 'বাম' বা 'কমিউনিস্ট' বিরোধী চিরুণী অভিযান চলছিল। শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে অসংখ্য মানুষ কাজ হারিয়েছেন, জেলে ঢুকেছেন, উধাও হয়ে গেছেন, অপদস্থ হয়েছেন, কুৎসা অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন।

১৯৫৩ সালে কোরিয়া যুদ্ধের অবসানের পর হিনটন দেশে ফেরেন তাঁর বিপুল পরিমাণ দলিল দস্তাবেজ নোট সহ। মার্কিন বিমানবন্দরে কাস্টমস এগুলো বাজেয়াপ্ত করে এবং সব তুলে দেয় কুখ্যাত 'সিনেট কমিটি অন ইন্টারনাল সিকিউরিটি'র হাতে। তখন দেশজুড়ে এই কমিটির নেতৃত্বে ব্যাপক ত্রাস চলছিল। হিনটন এফবিআইসহ নানা সংস্থার একটানা হয়রানির মধ্যে থাকেন বহুবছর। তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করা হয়, সব ধরনের শিক্ষকতার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। মায়ের জমিতে কৃষিকাজ করেই তিনি এইসময়ে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। কিন্তু তারপরও এই সময়ে তিনি অবিরাম চীন বিপ্লবের পক্ষে কথা বলেন এবং আদালতের লড়াই চালিয়ে যান। পনেরো বছর পর তিনি আদালতের রায়ে সব কাগজপত্র ফেরত পেয়েছিলেন। এরপর এগুলোর ভিত্তিতে তিনি লংবো নামক সেই গ্রামে ভূমি সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে লেখেন ফানশেন গ্রন্থ। সব বড় প্রকাশক এই বই প্রকাশে অস্বীকৃতি জানানোর পর মান্থলি রিভিউ প্রেস এটি প্রকাশ করে। প্রায় ৭ শ' পৃষ্ঠার এই বই বহু হাজার কপি বিক্রি হয় এবং প্রায় সাথে সাথেই দশ ভাষায় অনুবাদ হয়। এর ভিত্তিতে ডেভিড হেয়ার নামে বিখ্যাত নাট্যকার নাটক রচনা করেন এবং প্রথম তা মঞ্চস্থ হয় লন্ডনে। পরে অন্য প্রকাশকেরাও এর অন্য সংস্করণ প্রকাশ করে।

ফানশেন নাম ও এই বই সম্পর্কে হিনটন ভূমিকাতে লেখেন:

'প্রতিটি বিপ্লবই নতুন নতুন শব্দ নির্মাণ করে। চীনা বিপ্লব সম্পূর্ণ নতুন এক শব্দভাণ্ডারই নির্মাণ করেছে। এই শব্দভাণ্ডারে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো ফানশেন। এর আক্ষরিক অর্থ 'শরীর ঘোরানো' বা 'পাল্টে দেওয়া'। চীনের কোটি কোটি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের কাছে এর অর্থ উঠে দাঁড়ানো, জোতদার জোয়াল ছুঁড়ে ফেলা, জমি ঘর উপকরণ যন্ত্রপাতি পাওয়া। এর অর্থ আসলে এর থেকেও বেশি। এর অর্থ

কুসংস্কার ছুঁড়ে ফেলা, বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা, নিরক্ষরতা দূর করা এবং পড়তে শেখা। এর অর্থ নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে দেখা বন্ধ করা এবং নারীপুরুষে সমতা আনা, গ্রাম প্রশাসন আমলাদের হাত থেকে মুক্ত করে নির্বাচিত পরিষদের হাতে দেয়া। এর অর্থ এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করা। সেজন্যই এই বইএর নাম ফানশেন। লং বো গ্রামের মানুষেরা কীভাবে এক নতুন বিশ্ব নির্মাণ করেছেন এটা তারই কাহিনী।'

পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ

চীন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ১৯৫৩ সালে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন আর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোরিয়া যুদ্ধের বোঝা সামলানোর সময়। আর তার সাথে গ্রামে শহরে নতুন প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন সম্পর্ক এবং সংস্কৃতি নির্মাণের অবিরাম কর্ম উৎসব ক্রমে সেসময় বিস্তৃত হচ্ছিলো সারাদেশে।

বিপ্লবী সরকার গঠন করবার সময় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সামনে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের তিন দশকের অভিজ্ঞতা। রুশ বিপ্লবের পর সেখানে সাম্রাজ্যবাদী জোটবদ্ধ হামলা মোকাবিলা, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির রূপান্তরের কঠিন অধ্যায়, গ্রামাঞ্চলে যৌথকরণে জটিলতা, শিল্পায়নের সাফল্য ও ব্যর্থতা, পার্টির ভেতরের দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসের মুখ থেকে বের হয়ে বিশ্বজয়ীর অবস্থান লাভ সোভিয়েত ইউনিয়নকে তখন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে প্রধান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। সেসময় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী, জাতীয় মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল পথপ্রদর্শকের। সেই হিসেবে চীনের বিপ্লবী লড়াইএও সোভিয়েত প্রতিনিধিরা বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করেছেন। বিপ্লবের আগে ও পরে চীনে সোভিয়েত সমর্থন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের কোটি কোটি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের কাছে এর অর্থ উঠে দাঁড়ানো, জোতদার জোয়াল ছুঁড়ে ফেলা, জমি ঘর উপকরণ যন্ত্রপাতি পাওয়া। এর অর্থ আসলে এর থেকেও বেশি। এর অর্থ কুসংস্কার ছুঁড়ে ফেলা, বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা, নিরক্ষরতা দূর করা এবং পড়তে শেখা। এর অর্থ নারীকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে দেখা বন্ধ করা এবং নারীপুরুষে সমতা আনা, গ্রাম প্রশাসন আমলাদের হাত থেকে মুক্ত করে নির্বাচিত পরিষদের হাতে দেয়া। এর অর্থ এক নতুন পৃথিবীতে প্রবেশ করা।

তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, পথ ও পদ্ধতি, অগ্রাধিকার, নীতি ও কৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের সাথে চীনা নেতৃবৃন্দের অনেকবারই মতবিরোধ হয়েছে। প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চীনা নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত দিকনির্দেশনা অগ্রাহ্য করেই কাজ করেছেন। পরে প্রমাণিত হয়েছে, সোভিয়েত সব পরামর্শ শুনলে চীনের কমিউনিস্টরা নিজেদের হাতে ক্ষমতা আনতে পারতেন না, হয়তো তাদের কুওমিনটাং-এর অধীনস্ত থাকতে হতো। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের পরিস্থিতি নিজেরা উপলব্ধি করবার এবং যথাযথ লাইন নির্ধারণের ক্ষমতা, আর সেই অনুযায়ী নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নেবার সাহস ও সাবালকত্বই চীনের বিপ্লবীদের সফল করেছিল। এর থেকে এটাও বুঝতে সহজ হয় যে, কেনো এবং কীভাবে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে 'রুশপন্থী' ও 'চীনপন্থী' রাজনীতি বরাবর নাবালক থেকে গেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি, সমাজ ও শ্রেণিবিন্যাস, শিল্পায়নের মাত্রা, ভৌগোলিক অবস্থান, সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা, সাংস্কৃতিক গঠন ও লড়াইএর ইতিহাস ইত্যাদিতে রাশিয়ার সাথে পার্থক্য যেমন চীনের বিপ্লবের ধরনে ভিন্নতা এনেছে; তেমনি বিপ্লব-উত্তর সমাজতন্ত্র গঠনেও নতুন চিন্তা নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির তাগিদ তৈরি করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা ছিল চীনের পথ অনুসন্ধানে বড় অবলম্বন। রুশ বিপ্লবে কৃষকদের ভূমিকা যতোটা ছিল, চীনে বিপ্লবের প্রতিটি পর্যায়ে কৃষক সমাজের ভূমিকা ছিল তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়া ক্ষমতা গ্রহণের আগেই চীনা বিপ্লবীরা গ্রামাঞ্চলে ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে নতুন ভূমি ব্যবস্থা পত্তনের যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তার সুযোগ রুশ বিপ্লবীরা পাননি। সেকারণে রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে জমির জাতীয়করণ ও যৌথকরণ কর্মসূচি অনেক কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। এসব কাজের ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করবার শিক্ষা চীনা বিপ্লবীদের সামনেই ছিল।

বরাবরই চীন বিশ্বের সবচাইতে জনবহুল দেশ। বিপ্লবের পর অনুষ্ঠিত প্রথম জনশুমারী অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে, তখন জনসংখ্যা পাওয়া যায় ৫৮ কোটি ৩০ লক্ষ। বিপ্লবকালে এই সংখ্যা ৫০ কোটির বেশি ছিল বলে ধারণা করা যায়। এতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে আবাদী জমি মোট জমির শতকরা মাত্র ১৩ ভাগ। জনসংখ্যার তুলনায় পানির প্রাপ্যতাও কম। কোনো কোনো অঞ্চলে এর সংকট ছিল তীব্র। তবে প্রাচীন কাল থেকেই চীনে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সংগঠিত ব্যবস্থা ছিল। এর বিকাশের মধ্য দিয়ে আবাদযোগ্য জমির প্রায় পুরোটাই আবাদের অধীনে এসেছিল ১৯৪৯ এর আগেই। কিন্তু তাতে অনাহার, দারিদ্র, অমানবিক দুর্দশা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুক্তি মেলেনি। বিপ্লবীদের সামনে সমস্যা ছিল তাই প্রথমত, বিশাল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন; এবং দ্বিতীয়ত, খাদ্য ও জমির ওপর জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা।

বিশ্বের শতকরা ৫ ভাগ পানি ও শতকরা ৭ ভাগ আবাদী জমি দিয়ে শতকরা ২০ ভাগ মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা চীনের জন্য সবসময়ই একটি গুরুদায়িত্ব হিসেবে থেকেছে। ১৯৪৯ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল মোট ১০ কোটি টন। মাথাপিছু প্রাপ্যতা ছিল ২০০ কেজি। এই উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ভূমিতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় চীনের মানুষ কয়েকটি ধাপে অগ্রসর হলো। কৃষক জনগণকে সাথে নিয়ে, ব্যাপক অংশগ্রহণের ভিত্তিতে, অংশগ্রহণমূলক স্থায়ী একটি কাঠামোর দিকে অগ্রসর হলো চীনা পার্টি এবং তার সাথে যুক্ত বহুরকম সংগঠন। আগে থেকে কোনো মডেল ছিল না। শুধু ছিল জীবন, ভূমিসহ সকল সম্পদ এবং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় কতিপয় শোষক দুর্বৃত্ত বাদে সর্বজনের মালিকানা নিশ্চিত করবার লক্ষ্য ও দৃঢ়চিত্ত পদক্ষেপ।

এই ধারায় গ্রামে গ্রামে ভূমি সংস্কার হয়ে দাঁড়ায় গরীব নারী পুরুষের উৎসবে। সকল পর্যায়েই নীচে থেকে ভেতর থেকে সবার অংশগ্রহণ ও সম্মতির ভিত্তিতেই জোতদার সমরপ্রভুর জমি জাতীয়করণ, জমি বিতরণ এবং সমবায়ী কাঠামো নির্মাণের কাজ অগ্রসর হয়। কয়েকবছরে সারাদেশে কমিউন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই ধারা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে পরিণতি লাভ করে। এর পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো ছিল: পারস্পরিক সহযোগী দল, প্রাথমিক সমবায়, উচ্চতর

সমবায় এবং কমিউন।

ভূমিব্যবস্থা: প্রাথমিক সমবায় থেকে কমিউন

চীনে জমিদার জোতদাররা মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ হলেও তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল মোট আবাদী জমির শতকরা ৭০ ভাগ। বেশিরভাগ জমি দরিদ্র কৃষক ও ভূমিহীন মজুরেরা বর্গা নিয়ে ক্ষুদ্রায়তনেই চাষ করতেন। ১৯৫৩ সালের মধ্যে কৃষি ও গ্রামীণ সমাজের চেহারা পাল্টে যায়। ভূস্বামীদের ক্ষমতার ভিত্তি উৎপাটিত হয়। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন সম্পর্ক সমাজে প্রাণখুলে বিকশিত হবার চেষ্টা করতে থাকে। প্রায় ৩১ কোটি মানুষ ভূমি সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ৩০ কোটি কৃষক যাদের খুব কম জমি ছিল কিংবা কৃষিমজুর-বর্গাচাষী যাদের কোনো জমি ছিল না, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে তাদের হাতে আসে প্রায় ১২ কোটি একর জমি আর তার সাথে কৃষি যন্ত্রপাতি, গবাদিপশু, ঘরবাড়ি। জমিদার জোতদারদের বকেয়া খাজনা ঋণ সব বাতিল করা হয়।[১]

ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াফত ও তার বণ্টনের পর শুরু হয় দ্বিতীয় পর্ব। প্রথমে প্রাচীন পারস্পরিক সহযোগিতার প্রথা অনুযায়ী গড়ে উঠে পারস্পরিক সহযোগী দল। একে বলা হয় প্রাক সমবায় স্তর। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে পার্টি গৃহীত নীতি অনুযায়ী কয়েকটি পারস্পরিক সহযোগী দল মিলে আধা সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের প্রাথমিক সমবায় গঠন শুরু হয়। এই কাঠামোতে জমি, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ওপর সদস্যদের ব্যক্তি মালিকানা থাকতো। একসাথে আবাদ হতো এবং জমি, গবাদিপশু, কৃষি সরঞ্জাম এবং শ্রম অনুযায়ী ফসল বিতরণ হতো।

জমি জাতীয়করণ না করে ক্রমান্বয়ে যৌথ চাষাবাদের মধ্যে সকলকে সম্পৃক্ত করে বৃহদায়তন কৃষির দিকে অগ্রসর হয় চীন। পার্টির মধ্যে দুটো বিপরীত মতের বাইরে থেকে মাও সেতুং এই ধারায় পার্টিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন অবিরাম আলোচনা, বিতর্ক, ও গবেষণার মধ্য দিয়ে। একটি মত ছিল আইনের মাধ্যমে সকল ব্যক্তি মালিকানা বিলুপ্ত করে শিল্প কৃষিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ নিরঙ্কুশ করার পক্ষে। এর বিপরীত মত ছিল যৌথ চাষাবাদের প্রবর্তন না করে বাজার, পণ্য উৎপাদনের বিধি মোতাবেক ব্যক্তি মালিকানার বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটানো। শিল্পখাতের বড় অংশ বাজার অর্থনীতির নিয়মে চালানোর পক্ষেও ছিলেন তাঁরা। আমদানি রপ্তানি ও আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণেরও তাঁরা বিরোধী ছিলেন।[২] মাও সেতুং এই দুই বিপরীত মতকেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে মতদুটোর সংঘাত শেষ হয়নি, কোনো মীমাংসাও হয়নি। বরং ৬০ ও ৭০ দশকে এই সংঘাত আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তার নানাদিক আমরা পরবর্তী আলোচনাগুলোতে আরও পাবো।

বস্তুত চীনে বিপ্লবী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরও বেশ কয়েক বছর ধনী কৃষকসহ ব্যক্তি মালিকদের অবস্থান বেশ ভালো মাত্রায় ছিল। গ্রামাঞ্চলে ভূমি সংস্কারের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি নিয়ে এবং ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিমালিকানাধীন কৃষিকে যৌথ চাষাবাদ ও সমবায়ের দিকে নিয়ে যাবার পক্ষে মাও সেতুং অনেক লিখেছেন, বক্তব্য রেখেছেন। সংক্ষেপে তাঁর চিন্তা বোঝা যায় নীচের বক্তব্যে:

> ঐতিহাসিক পটভূমি, সমাজ ও শ্রেণিবিন্যাস, শিল্পায়নের মাত্রা, ভৌগোলিক অবস্থান, সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা, সাংস্কৃতিক গঠন ও লড়াইএর ইতিহাস ইত্যাদিতে রাশিয়ার সাথে পার্থক্য যেমন চীনের বিপ্লবের ধরনে ভিন্নতা এনেছে; তেমনি বিপ্লব-উত্তর সমাজতন্ত্র গঠনেও নতুন চিন্তা নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরির তাগিদ তৈরি করেছে।

'চীনে বিশাল জনসংখ্যার জন্য অপর্যাপ্ত জমি (সারা দেশে গড়পড়তা মাথাপিছু জমি ৩ মৌ, দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলোর বিভিন্ন অঞ্চলে মাথাপিছু জমি ১ মৌ কিংবা তারও কম) রয়েছে।[৩] প্রাকৃতিক দুর্যোগ খুবই ঘনঘন (প্রতি বছর বিশাল পরিমাণ আবাদী জমি বন্যা, খরা, পোকা, ইত্যাদি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।...বর্তমানে বিক্রয়ের মতো খাদ্যশস্য এবং কাঁচামাল উৎপাদনের মাত্রা খুবই নীচু কিন্তু এগুলোর জন্য রাষ্ট্রের চাহিদা প্রতিদিনই বাড়ছে, এবং এতে সৃষ্টি হয়েছে গভীর দ্বন্দ্ব।...দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা ভারী শিল্প যা কৃষিতে ব্যবহারের জন্য ট্রাক্টরসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, পরিবহণের জন্য আধুনিক উপকরণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। এগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হবে তখনই যখন বৃহদায়তন চাষাবাদ করা যাবে এবং তা সমবায়ের মাধ্যমেই সম্ভব। আমরা সমাজ ব্যবস্থাতেই শুধু বিপ্লব আনছি না, ব্যক্তি মালিকানাধীন থেকে সামাজিক মালিকানায় পরিবর্তন শুধু নয়, পরিবর্তন আনতে হবে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, হস্তশিল্প থেকে প্রবর্তন করতে হবে বৃহদায়তন আধুনিক যন্ত্রশিল্পের। এবং এই দুইদিকের বিপ্লব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।...এছাড়া হালকা শিল্পের ব্যাপক বিকাশের জন্য একইসঙ্গে কৃষি এবং ভারী শিল্পের বিকাশ প্রয়োজন।'[৪]

১৯৫৬ সাল নাগাদ বিকশিত কৃষি সমবায়ের উদ্ভব হয়। এই পর্যায়ে জমি ও কৃষি সরঞ্জামের মালিকানা ক্রমে সমবায়ের হাতে স্থানান্তরিত হয়। এইসব সমবায়কে একত্রিত করেই ১৯৫৮ সাল নাগাদ নতুন একটি উৎপাদন-প্রশাসনিক-সামাজিক কাঠামো উদ্ভূত হয় যার নাম কমিউন। তিন পর্যায়ে এই কাঠামো কাজ করতো: উৎপাদন টিম, উৎপাদন ব্রিগেড এবং কমিউন। উৎপাদন টিম গঠিত হতো ৩০ থেকে ৫০টি কৃষক পরিবার নিয়ে। এই উৎপাদন টিমের কাজ হলো ব্যক্তিগত খণ্ডজমি বাদে বাকি জমি ও উৎপাদন উপায় নিয়ে যৌথ উৎপাদন এবং তার বিতরণ পরিচালনা। কয়েকটি উৎপাদন টিম নিয়ে গঠিত হতো একেকটি উৎপাদন ব্রিগেড। এর সদস্য ৩০০ থেকে ৪০০ পরিবার। ব্রিগেড পর্যায়েই উৎপাদন উপকরণ যৌথ সম্পত্তি হিসেবে রাখা হতো। মেরামত ও পরিচালনাও এই পর্যায় থেকেই হতো। কমিউন গঠিত হতো এরকম কয়েকটি ব্রিগেড নিয়ে যাতে সদস্য হিসেবে থাকতেন ৪ থেকে ৫ হাজার পরিবার। কমিউন কৃষি বিষয়ে পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন ছাড়াও এলাকায় গ্রামীণ শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা কার্যক্রম সমন্বয় করবার দায়িত্বে ছিল। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও পরিবেশ, আইন ও সাংস্কৃতিক দিকগুলোও কমিউনের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত ছিল।[৫]

নারী প্রশ্ন

এই সময়কালে সামাজিক আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে পরিবর্তনের আইন প্রণয়ন ও তার পক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল অত্যাবশ্যক। এর মধ্যে নারীপ্রশ্ন ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে যেকোনো শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলন নারীর শৃঙ্খলকে আঘাত করে। নারীর জন্য পরিসর তৈরি হয়। আবার নারীর শৃঙ্খলমুক্তির বিষয়টি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত না হলে অন্য কোনো শৃঙ্খলমুক্তির আন্দোলনও সফল হতে পারে না, মুখ থুবড়ে পড়ে। বস্তুত চীনে ১৯১১ সাল থেকে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলনে ধীরে ধীরে নারীর অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। সেবছরই কিউ জিন নামে এক

নারী শহীদ হয়েছিলেন। পরে তিনি চীনের বিদ্রোহী বিপ্লবী নারীর প্রতীকে পরিণত হন।

বিপ্লব পূর্বকালে চীনে প্রচলিত বচন থেকে সমাজে নারীর অবস্থান আন্দাজ করা যায়। এলিজাবেথ ক্রল তাঁর গবেষণাকালে এসব বচনের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন যেমন, 'নুডলস যেমন ভাত নয়, নারীও তেমনি মানুষ নয়', 'স্ত্রী হলো কেনা ঘোড়ার মতো, আমি তাকে চালাবো এবং যখন খুশি চাবুক মারবো', 'স্বামীর মৃত্যুর পর সতী স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে মৃত স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং আর বিয়ে না করা', 'পুরুষের স্থান সর্বত্র, নারীর স্থান শুধুমাত্র রান্নাঘরে', 'নারী যে কুয়া খুঁড়বে তাতে পানি উঠবে না, যে নৌকা মেয়েরা চালাবে তা পানিতে ডুববে'।[৬]

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে নারীপ্রশ্ন গুরুত্ব পেয়েছে, এই বিষয় নিয়ে নারী কমরেডদের অবিরাম লড়াইও জারি ছিল। দীর্ঘপথ দীর্ঘসময়ে চলা লং মার্চ পার্টির ভেতর নেতা কর্মীদের মতাদর্শিক সাংস্কৃতিক অনেক কিছুই নতুন করে চিন্তা ও বিন্যস্ত করবার মুখোমুখি করে। লংমার্চ চীনের বিভিন্ন লোকালয়, বিভিন্ন জাতিকে যেমন অভিন্ন লক্ষ্যে যুক্ত করে তেমনি নারীকে প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য এবং পুরুষের সঙ্গে যৌথ লড়াইএ যুক্ত করে। তার শারীরিক উপস্থিতি বিভিন্ন কর্মসূচি ও নীতিগত অবস্থানগুলোকে ঠিকঠাক মতো এগিয়ে নেবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৭]

১৯৫০ সালের মে মাসে বিবাহ সংস্কার আইন প্রবর্তন করা হয় যা হাজার বছরে নারীর অধস্তনতার আইনগত ভিত্তি ভেঙে দেয়। এই আইনে জোরপূর্বক বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। এই আইনে চীনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিবাহকে সাবালক নারী ও পুরুষের স্বেচ্ছাচুক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়। সম্পত্তি, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সন্তানের ওপর নারী সমান অধিকার লাভ করে। এই আইনে একইসঙ্গে পরিবারে দুজনের সমান দায়িত্বও নির্ধারিত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ অনেক সহজ করা হয়। বহুবিবাহ, পতিতাবৃত্তি, অবাঞ্ছিত মেয়েশিশু হত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়।

তবে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ছাড়া এই আইন বাস্তবায়ন সম্ভব ছিল না। সেজন্য ভূমিসংস্কারসহ বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জোতদার, সমরপ্রভু, বড় আমলাসহ সম্পত্তিশালী গোষ্ঠীর আধিপত্য শৃঙ্খল থেকে যতো মানুষ মুক্ত হতে থাকে ততই নারীর জন্য মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। কমিউন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর নারীর পক্ষে লড়াই আরও সহজ হয়। সারাদেশ জুড়ে শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, সর্বত্র শিশুযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, প্রসূতিকালীন ছুটি, সমান মজুরি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চেষ্টার পাশাপাশি চীনা নারী ফেডারেশনের অব্যাহত নজরদারি এবং মতাদর্শিক সংগ্রাম সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনকে অনেক স্পষ্ট করে তোলে।

কিন্তু হাজার বছরের প্রথা, চর্চা, বিশ্বাস, চিন্তার আধিপত্য দূর করা সহজ ছিল না। তাই ১৯৫৬ সালে নারী ফেডারেশন পার্টি কংগ্রেসে যে রিপোর্ট প্রদান করে তাতে বলা হয়:

'বর্তমান সময়ে তিনটি সমস্যা বিবেচনা করতে হবে: ১. যদিও নারী ক্যাডারদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু অনুপাত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা খুবই কম; ২. যদিও মেয়েদের ক্ষমতা এখন আগের তুলনায় বেশি তবুও তাদের সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং তাত্ত্বিক চেতনার মান অনেক নিচু; এবং ৩. নারী ক্যাডারদের বিপুল অধিকাংশ সন্তান লালন ও গার্হস্থ্য কাজেই বেশি সময় ব্যয় করেন।...আমরা দেখেছি যে, কিছু প্রতিষ্ঠান ও নেতৃস্থানীয় ক্যাডাররা পুরনো ভাবধারা, চিন্তা ও প্রথা প্রশ্রয় দেন যেগুলো নারী বৈষম্যবাদী। তাঁরা মনে করেন "তিনজন নারীও একজন পুরুষের সমান নন।" নারী ক্যাডারদের পদোন্নতির প্রশ্ন যখন ওঠে তখন নানারকম সংশয় সৃষ্টি করা হয়। তাঁরা মনে করেন, মেয়েদের যদি পদোন্নতি দেয়া হয় তাহলে তাঁরা সে কাজের জন্য নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন না, সন্তান প্রতিপালন নিয়ে নিজেরা ব্যস্ত থাকবেন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য বোঝা হয়ে ওঠবেন। সমান দক্ষ নারী ও পুরুষ উপস্থিত থাকলেও পুরুষকেই পদোন্নতির জন্য অগ্রাধিকার দেয়া হয়।'[৮]

অর্থাৎ আত্মসন্তুষ্টির ঘোরে আটকে না থেকে নারী প্রশ্নসহ নানা বিষয়ে পার্টির ভেতরে, এবং বিভিন্ন সংগঠনে লড়াই অব্যাহত থাকে। এর মধ্যে গ্রাম ও শহরের চেহারা দ্রুত পাল্টে যেতে থাকে। নারীর আত্মবিশ্বাসী উপস্থিতি বাড়তে থাকে সর্বত্র। দামি গাড়ি, বিদেশি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কমে যায় অনেক। কমে যায় বিত্তশালীদের শানশওকত। ভিখিরী উধাও হয়ে যায়। শহরে যানবাহনের মধ্যে দ্রুত বাড়তে থাকে সাইকেল।

প্রায় ৩১ কোটি মানুষ ভূমি সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ৩০ কোটি কৃষক যাদের খুব কম জমি ছিল কিংবা কৃষিমজুর-বর্গাচাষী যাদের কোনো জমি ছিল না, ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে তাদের হাতে আসে প্রায় ১২ কোটি একর জমি আর তার সাথে কৃষি যন্ত্রপাতি, গবাদিপশু, ঘরবাড়ি।

অর্থনীতির নতুন গতি

সমাজ ও অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের পাশাপাশি বিশাল দেশে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা গতিশীল করার জন্য ১৯৫২ পর্যন্ত অনেকগুলো ব্যবস্থা নেয়া হয়, যার ধারাবাহিকতা পরেও অব্যাহত থাকে। চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'পিপলস ব্যাংক অব চায়না'-র কর্তৃত্বে পুরো ব্যাংক ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হয়। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে মুদ্রাব্যবস্থা একীভূত করা হয়, ঋণ সংকোচন করা হয়, সরকারি ব্যয় কঠোর নিরীক্ষার মধ্যে আনা হয় এবং মুদ্রামান অক্ষুন্ন রাখবার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশিয় বাণিজ্য সম্প্রসারণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয় যার মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে উৎপাদকদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করতো এবং দেশি বিদেশি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতো। চীনে বিপ্লবপূর্ব সরকারের আমলেই শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর এক তৃতীয়াংশ এবং আধুনিক পরিবহণের বৃহদাংশ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল, বিপ্লবী সরকার প্রথমেই এগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। বাকি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোরও অনেকগুলো ক্রমে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। তবে ১৯৫২ সাল পর্যন্তও শতকরা ১৭ ভাগ শিল্প কারখানা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।

কৃষির কথা আগেই বলেছি। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে শতকরা ৪৮ ভাগ আবাদী জমি ভূস্বামীদের হাত থেকে নিয়ে গরীব বা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।[৯] এরপর পারস্পরিক সহযোগী দলের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে যৌথ চাষ এবং পরে কমিউন প্রতিষ্ঠার দিকে চীন অগ্রসর হয়। ১৯৫২ সাল নাগাদ কৃষক পরিবারের শতকরা ৩৯ ভাগ মানুষ পারস্পরিক সহযোগী দলে যুক্ত ছিল। এই বছরের মধ্যেই গ্রাম শহরের অর্থনীতি একটি স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছায়। দাম স্থিতিশীল হয়,

বাণিজ্য ব্যবস্থা সংগঠিত হয়, শিল্প ও কৃষি বিপ্লবপূর্ব কালের উৎপাদন সূচকে পৌঁছে তা অতিক্রমের দিকে অগ্রসর হয়।

বস্তুত ১৯৫৮ সালের মধ্যে কৃষিতে কমিউন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ আকার নেয়। এগুলো যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনেই অগ্রসর হয়ে একটি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে তা নয়, স্থানীয় উদ্যোগ এবং 'করতে করতে শেখা'ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে অনুষ্ঠিত পলিটব্যুরোর সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই গণকমিউনগুলোই গ্রামীণ চীনের নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো হিসেবে কাজ করবে। সারাদেশে মোট ৭৪ হাজার কমিউনের মধ্যে ৭ লক্ষ ৪০ হাজার বৃহৎ কৃষি সমবায় সংগঠিত হয়। বছরের শেষে সরকারি ঘোষণায় বলা হয় যে, শতকরা ৯০.৪ ভাগ কৃষক পরিবার কমিউনের অন্তর্গত হয়েছে। কমিউনগুলো ছিল তুলনামূলকভাবে স্বনির্ভর সমবায়ী ব্যবস্থা। যেখানে মুদ্রা ও মজুরি কর্মপয়েন্ট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও সংগঠক ফয়েজ আহমদ ৬০ ও ৭০ দশকে একাধিকবার চীন সফর করেন। প্রথমবার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আগে গিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন, এরপর গেছেন মাও পরবর্তী চীনে। তাঁর লেখায় দুই সময়েরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় যা চীনের পরিস্থিতি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ১৯৬৬ সালে কমিউন সফর করেছিলেন এবং একসপ্তাহ সেখানে কৃষকদের সাথে থেকেছেন। তাঁর লেখা থেকে এই বিশাল ও নতুন সমাজ-অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়। কমিউনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে ফয়েজ আহমদ লিখেছেন:

'বর্তমানে কৃষকদের প্রত্যেক দিনের কাজের ভিত্তিতে 'ওয়ার্ক পয়েন্টে' মাসিক মজুরী দেয়া হয়ে থাকে। তাছাড়া শস্যের মওসুমে বিনিপয়সায় শস্য ও শাকসব্জী তাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কোন পরিবারের জনসংখ্যা অধিক ও শ্রমশক্তি তার তুলনায় অল্প হলে কমিউন থেকে অতিরিক্ত পয়সা দেয়া হয় সংসার চালাবার জন্যে। কমিউনের সদস্যদের এখন জীবনের পাঁচটি রক্ষাকবজ রয়েছে যথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা। একটি কমিউনের ছোট-বড় শতাধিক গ্রামও থাকতে পারে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে পঁচিশ-ত্রিশটি গ্রাম একত্র করা হয়েছে। কমিউনের তিনটি স্তর বা বিভাগ। প্রথমে কমিউনের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, দ্বিতীয় স্তর ব্রিগেড ও ব্রিগেডের অধীন উৎপাদক টিম। প্রত্যেকটি টিমের কৃষকগণ বিভিন্ন গ্রুপে কাজ করেন।'

তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে আরও বলেছেন,

'কমিউন প্রতিষ্ঠার পর পল্লী সমাজে কয়েকটি ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথমে বাড়ীর কর্তা ব্যক্তির আয় ও ব্যয়ের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়েছে এবং একজনের রুজির উপর পরিবারের সবাই নির্ভর করেন না। কার্য্যক্ষম প্রত্যেকেই- মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে রোজগার করেন এবং শ্রম অনুযায়ী পয়সা পান। দ্বিতীয়ত:, অনেক কমিউনে সাধারণ খাবার ঘর চালু করা হয়েছে এবং এ সমস্ত পাবলিক ডাইনিং হলে যে কোন সদস্য স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশই নিজের বাড়ীতে রান্না করে খান, তদুপরি সর্ব্বত্র নার্সারী ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এর ফলে মহিলাদের কাজের সুবিধা হয়েছে এবং তাঁরা পারিবারিক ঝামেলা থেকে রেহাই পেয়েছেন।...কমিউনের কৃষক পরিবারের ব্যক্তিগত স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি কিছু নেই বলে একটা প্রচার রয়েছে। কিন্তু কোন কমিউনেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না। সমস্ত কমিউনেই কৃষকদের ব্যক্তিগত চাষাবাদের জন্য জমি দেয়া হয়।... এই জমিতে কৃষকগণ প্রধানত: বছরে তিনবার শাকসব্জী উৎপাদন করেন।'[১০]

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে চীন সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং মওলানা ভাসানীও। তাঁদের লেখাতে বিপ্লব-উত্তর চীনে পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া যায়।[১১]

> এইসব সমবায়কে একত্রিত করেই ১৯৫৮ সাল নাগাদ নতুন একটি উৎপাদন-প্রশাসনিক-সামাজিক কাঠামো উদ্ভুত হয় যার নাম কমিউন। তিন পর্যায়ে এই কাঠামো কাজ করতো: উৎপাদন টিম, উৎপাদন ব্রিগেড এবং কমিউন।

উচ্চলম্ফের বিপদ

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ছিল গণচীনের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকাল। ততদিনে সমগ্র চীনে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক অর্থনৈতিক কাঠামো নতুনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। কমিউন ব্যবস্থা ছিল এর প্রধান ভিত্তি। নতুন বিস্তৃত কমিউন ব্যবস্থার ওপর অনেকখানি ভর করেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। দেশের মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা তখন অনেক উঁচু। দেশের ভেতর ও বাইরে অনেক বিরুদ্ধ শক্তি। উৎপাদন ভিত্তি শক্তিশালী করতে হবে আবার বৈষম্য নিপীড়ন বিরোধী সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। প্রাক পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে দ্রুত বের হয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক শিল্পোন্নত শোষণমুক্ত সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে পার্টি ততদিনে অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিয়েছে। সমগ্র পার্টির মধ্যে তাই লক্ষ্য বাস্তবায়নে অস্থিরতা।

এই আবহের মধ্যে অনেক দ্রুত উন্নয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষী একটি পর্ব শুরু হয় এইসময়েই। মাও সেতুং এই কর্মসূচির মূল প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল কৃষি ও শিল্প দুইখাতেই সমান্তরালভাবে দ্রুত উন্নয়ন করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। এর পাশাপাশি উৎপাদন সম্পর্কে বিপ্লবীকরণ নিশ্চিত করতে হবে। আমলাতন্ত্র বিশেষজ্ঞ নির্ভরতা পরিহার করে রাজনৈতিক উদ্দীপনার ওপর ভর করতে হবে। স্বল্পস্থায়ী এই পর্বটি বৃহৎ উচ্চ লম্ফ বা The Great Leap Forward নামে পরিচিত।

পার্টির মধ্যে অর্থনীতির রূপান্তরে 'ধীর' এবং 'দ্রুত'লয় এই দুই মতই ছিল। লিউ শাউ চী সহ আরও অনেকে ধীরগতিতে অগ্রসর হবার পক্ষে ছিলেন। নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যক্তি মালিকানার ওপর আরও কিছুদিন নির্ভর করবার পক্ষে ছিলেন। তাঁদের মত টেকেনি। দ্রুতগতিতে শিল্পায়নের জন্য শস্য ও স্টীল উৎপাদনে উচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। কমিউন ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি শুরু হয়। উদ্বৃত্ত ফসল শহরে বিক্রি এবং রফতানির মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের সম্পদ সংগ্রহের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়। মৌলিক ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ অগ্রাধিকার প্রকল্প তৈরি হয়। এরজন্য বৃহদাকার বিনিয়োগ ছাড়াও সারাদেশে কমিউনে স্টীল উৎপাদনেরও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়। কারখানার শ্রমিকের চাহিদা বেড়ে যায়। সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। শহরে রেশনিং প্রথা চালু হয়।

১৫ বছরের মধ্যে যুক্তরাজ্যকে অতিক্রম করা, ১ বছরের মধ্যে স্টীল উৎপাদন দ্বিগুণ করা এভাবে উচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তা জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। সারাদেশে গ্রাম শহরে, নিজেদের জীবন সামষ্টিকভাবে পরিবর্তনের জন্য সকল ধরনের কাজে পার্টির ক্যাডারসহ শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সমাজ

অর্থনীতির বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য ইচ্ছা, শ্রম ও আন্তরিকতাই যথেষ্ট নয়। উন্নয়নের বস্তুগত ভিত্তি, পূর্বশর্ত, পুরনো ব্যবস্থার রেশ, প্রকৃতির নিয়ম, বিজ্ঞান প্রযুক্তি আর সেইসাথে দক্ষ জনশক্তির যোগানের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর যথাযথভাবে পর্যালোচনা এবং সেই অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ দরকার ছিল। এর যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। তার ফলে প্রথম দিকে সাফল্যের গতি দ্রুত হলেও শিগগিরই নানা জটিলতা দেখা যেতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে বিপর্যয়ও দেখা দেয়। রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক কোটা পূরণ, রফতানির চাপ কোনো কোনো অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি তৈরি করে।

১৯৫৭ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালের মধ্যে কারখানা শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। শহরে খাদ্য চাহিদা বাড়ে। রাষ্ট্রের খাদ্য সংগ্রহের তাগিদ বাড়ে। খাদ্য ও পণ্যের তুলনায় আয় বেড়ে যায়। খাদ্য রফতানি অব্যাহত রাখায় চাহিদার তুলনায় খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে। পরিস্থিতির ভারসাম্যহীনতায় ১৯৬০ সালের পর শিল্প বিনিয়োগে বড় পতন ঘটে। অন্যদিকে সেচ ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ এবং স্টীল উৎপাদন দ্রুত সম্প্রসারণ করতে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে। বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে নিহত হবারও অনেক রিপোর্ট পাওয়া যায়। ১৯৬০-৬১ সালে জনসংখ্যার হ্রাস এই ধারণা শক্তিশালী করে।

বিভিন্ন বিপর্যয় ও জটিলতা সৃষ্টির কারণে পার্টির মধ্যে এই কর্মসূচি নিয়ে সমালোচনা বাড়তে থাকে। প্রথমদিকে সমালোচকদের বুর্জোয়া বিপথগামী বলা হয়, উচ্চপদে অনেক রদবদলও করা হয়। কিন্তু এর সমাধান খুঁজে না পাওয়ায় ১৯৬১ সালের জানুয়ারিতে অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির নবম প্লেনামে কৃষি ও শিল্প উচ্চলম্ফ কর্মসূচির সংশোধন আনা হয়। খাদ্য রফতানি বন্ধ করা হয়। সংকট সামাল দিতে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে খাদ্য আমদানি করা হয়।

১৯৬২ সালে পার্টির অনেকগুলো সম্মেলন হয়। উচ্চলম্ফের কর্মসূচির বিপর্যয়ের কারণে পার্টিতে মাও এর অবস্থানও দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক অপসারিত কর্মকর্তা পুনর্বাসিত হন। মাও বিরোধীদের অবস্থান শক্তিশালী হয়। এক পর্যায়ে মাওসেতুং নিজেও পার্টির এক সম্মেলনে তড়িঘড়ি নানা ভুল পদক্ষেপ নেবার বিষয়ে আত্মসমালোচনা করেন। এরপর বেশ কিছুদিন রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম থেকে মাও সেতুং কার্যত বিচ্ছিন্ন ছিলেন।.....(চলবে)

আনু মুহাম্মদ: লেখক, শিক্ষক। অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anu@juniv.edu

তথ্যসূত্র:

১। China.org.cn. September 15, 2009

২। Mark Selden and Victor Lippit (ed): The Transition to Socialism in China, NY, ১৯৮২ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিপ্লবের শুরুতে বিভিন্ন বিতর্ক ও জটিলতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

৩। মৌ হলো চীনে জমি পরিমাপের একক। চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে এর আয়তনের তফাৎ ছিল। গড়ে এর পরিমাণ ছিল ১০ থেকে ১৬ শতাংশ, এক একরের ৬ ভাগের ১ ভাগেরও কম।

৪। Mao tse tung: "On the Coooperative Transformation of Agriculture", July 31. 1955, Selected Works, Vol-5, pp194-198.

৫। এবিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে: আনু মুহাম্মদ: "চীনে সমাজতন্ত্র এবং শ্রেণী সংগ্রাম" প্রবন্ধে। এটি লেখকের *অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র: সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতা* গ্রন্থভুক্ত। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

৬। Elizabeth Croll: *The Women's Movement in China* 1949-1973, London, 1974.

৭। আমার *নারী, পুরুষ ও সমাজ* গ্রন্থের একটি অধ্যায় "বিপ্লব উত্তর সমাজে নারীর অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণ"-এ অন্যদেশগুলোর সাথে চীনের অভিজ্ঞতাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সর্বশেষ সংস্করণ, সংহতি প্রকাশন, ২০১০।

৮। পূর্বোক্ত

৯। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে: Mark Selden and Victor Lippit (ed): *The Transition to Socialism in China*, NY, 1982.

১০। ফয়েজ আহমদ: *চীনে ক্রান্তিকাল*, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা। ১৯৮২।

১১। শেখ মুজিবুর রহমান: *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, ঢাকা ২০১২। মওলানা ভাসানী: মাও সে তুঙ এর দেশে, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৭২ বাংলা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে একটি দেয়াল লিখন